জাতীয় বাজেটের গণতন্ত্রায়ন ও বিকেন্দ্রিকরণ

একটি ধারণাপত্র

গণতান্ত্রিক বাজেট

জাতীয় বাজেট বা জনবাজেট স্বাধীন বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের আশা আকাংখার প্রতিচ্ছবি - এমনটা শুধু ভিশন বা স্বপ্ন নয়, এটা দেশের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়। প্রতিটি নাগরিক, জাতিগোষ্ঠি ও অঞ্চলের স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত উন্নয়ন ছাড়া কোন ভাবেই জাতীয় উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সুষম জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা, যা হতে হবে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠি ও অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার নিরিখে ন্যায্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সংবিধানের ১৯.১ (ক) অনুচ্ছেদে সুষম জাতীয় উন্নয়ন এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখা দরকার।

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি অত্যন্ত কেন্দ্রিভূত সরকার রয়েছে। একটি গ্রামে রাস্তা বানাতে হলে বা একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে রাজধানীতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রতিটি নিয়ন্ত্রণবিধি ঢাকা থেকে শুধু উদ্ভূত নয় তার কার্যকরী প্রয়োগও হয় কেন্দ্র থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারে যে ব্যবস্থা তাতে প্রতিটি বিষয় নানা আমলাতান্ত্রিক স্তরে বারবার বিবেচিত হয়ে, অন্ততপক্ষে প্রায় ডজনখানেক ঘাট পেরিয়ে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় কোন জবাবদিহিতার প্রয়োজন পড়ে না এবং প্রতিটি স্তরে অন্যায় আদায়ের (ঘুষের) বা হয়রানির সুযোগ পূর্ণোদমে ব্যবহৃত হয়।[১]

সংবিধান মোতাবেক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার এখন সময়ের দাবি। গত চার দশকে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষণা, আলোচনা ও আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পাশাপাশি জাতীয় বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনার বিকেন্দ্রিকরণের বিষয়টি তেমনভাবে উঠে আসেনি কোন নীতি আলোচনায়। অথচ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রাজস্ব/কর কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ প্রয়োজন। কেননা আমলানির্ভর ও অতিকেন্দ্রিভূত জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় সাংসদদের কার্যকরি অংশগ্রহণের সুযোগই যেখানে সীমিত সেখানে সাধারণ নাগরিক ও পেশাজীবীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন নিশ্চিত করা অনেক জঠিল ও কঠিন বিষয়। বাজেট প্রক্রিয়ার ও কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ ছাড়া তাই কার্যকর জনঅংশগ্রহণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাজেটসহ নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন জণগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকার কারণে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রায় অনুপস্থিত, যার ফলে দূর্নীতি আজ দারিদ্র দূরীকরণে সবচেয়ে বড় কাঠামোগত বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

কিছুদিন আগেও 'জিনিসপত্রের দাম বাড়লো না কমলো' এটাই ছিল বাজেট বিষয়ে সাধারণ মানুষের আলোচনার মূল বিষয়। একসময় বাজেট বিষয়ক জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা ছিল শুধু অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের সিলেবাসের বিষয়। শীর্ষ ব্যবসায়ী শ্রেণী ছাড়া বাজেট নিয়ে কাউকে হৈ চৈ করতে দেখা যেত না। সরকারি দলপন্থীদের গতানুগতিক অভিনন্দন বাণী আর বিরোধী দলের ঢালাও প্রত্যাখ্যানের মিছিল রাজপথ আর পত্রিকার পাতা অলংকৃত করতো। নব্বইয় দশক পরবর্তি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তোরণের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় বাজেটকে কেন্দ্র করে পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি

হওয়ায় বাজেটকে কেন্দ্র করে নতুন আলোচনা তৈরির পথ প্রশস্ত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এখন প্রাকবাজেট আলোচনা ও বাজেট প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষকে সম্পৃক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। নারীর বাজেট, কৃষকের বাজেট, প্রতিবন্ধীর বাজেট ইত্যাদি নির্দিষ্ট খাত ভিত্তিক বাজেট প্রস্তাবনা করা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে, মূলতঃ ক্ষেত্র ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এসব আলোচনার মূল সুর। বাজেট কেন্দ্রিক এই সকল প্রস্তাবনা ও আলোচনার সবই কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়ে থাকে, অথচ এ সকল আলোচনা-প্রস্তাবনা সরকারের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় কিনা তার যথাযথ সন্দেহ মনে মধ্যে রেখেই সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আর মন্ত্রী মহোদয়দের শীর্ষ ব্যবসায়ী গোষ্ঠি ছাড়া এতসংখ্যক শ্রেণী পেশার মানুষের দাবি শোনার অবকাশই বা কোথায়! সুতরাং জনআকাংখা ও দাবি সরকারের কাছে পৌঁছাতে হলে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারিকে জনতার কাছাকাছি থাকতে হবে তথা বাজেট প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রিকরণ ও গণতান্ত্রিকরণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক বাজেট শিরোনামে একটি নাগরিক উদ্যোগ ও তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রয়াস ।

বাজেটকে গণতান্ত্রিক করার এই আন্দোলনে স্থানীয় নাগরিক কমিটি, উন্নয়ন সংগঠন, তৃণমূল সংগঠন, সংবাদমাধ্যম/ গোষ্ঠি ও সমাজের অন্যান্য অগ্রসর চিন্তাধারার মানুষেরা দেশের সকল মানুষের ন্যায্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের কাছে ওকালতি করতে কাজ করছেন। এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সে লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

কেন্দ্রিভূত বাজেটে কিছু বৈষ্যমের চিত্র

২০০৮-০৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৯,৫০০ কোটি টাকা। দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি বিবেচনায় মাথাপ্রতি যার হিস্যা দাঁড়ায় ১৩০০ টাকা। অথচ ঐ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, যশোর, মেহেরপুর এবং ময়মনসিংহে মাথাপিছু বরাদ্দের (জুলাই-মার্চ) পরিমান ছিল সর্বনিম্ন অর্থাৎ ঠাকুরগাঁও ২৯০ টাকা, জয়পুরহাট ৩০০ টাকা, দিনাজপুর ৩৪০ টাকা, যশোর ৩৮০ টাকা, মেহেরপুর ৩৮০ টাকা, গাইবান্ধা ৩৯০ টাকা, ময়মনসিংহ ৩৯০ টাকা। যদিও দারিদ্র ম্যাপ অনুযায়ী ঐসময়ে এই কয়েকটি জেলা ছিল সবচেয়ে দরিদ্রপ্রবণ।

মৌলিক চাহিদা ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্র্যের হার (দারিদ্র্য সীমার নিচে জনসংখ্যা (%)

	হতদরিদ্র	দরিদ্র
জাতীয়	২৫.১	৪০.০
বরিশাল	৩৫.৬	৫২.০
চট্টগ্রাম	১৬.১	৩৪.০
ঢাকা	১৯.৯	৩২.০
খুলনা	৩১.৬	৪৫.৭
রাজশাহী ও রংপুর	৩৪.৫	৫১.১
সিলেট	২০.৮	৩৩.৮

সূত্র:বিবিএস, খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

আশ্চর্যজনক বিষয় হলো অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল অঞ্চলগুলোতে ঐ নয় মাসে এর ঠিক বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। যেমন: ঢাকা ৭১০ টাকা, চট্টগ্রাম ৮৫০ টাকা, ফেনী ১১৬০ টাকা, সিলেট ১০৮০ টাকা। দেখা যাচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, সিলেট এই জেলালোতে মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমান তুলনামূলকভাবে বেশি। এই দুইটি ছক তুলনামূলক বিচার করলে জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক বাজেট প্রনয়ণের গুরুত্ব খুব সহজে অনুধাবন করা যায়। একইসাথে এটাও দেখা যায় যে, বেশি বরাদ্দপ্রাপ্ত জেলাগুলোতে অর্থবরাদ্দ দরিদ্র মানুষের অনুকূলে নয়। আবার সামগ্রিক বিচারে গ্রামের তুলনায় শহরে বরাদ্দ বেশি।

দারিদ্র্য হ্রাসে বিভাগভিত্তিক বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প-কারখানার ভূমিকা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে দেখবো কৃষিভিত্তিক মাঝারি শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর সুযোগ থাকলেও উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়েনি অর্থাৎ নতুন শিল্প-কারখানা তেমন গড়ে ওঠেনি, বরং অসংখ্য মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে

বাজেট বিকেন্দ্রিকরণ
সাংবিধানিক অঙ্গীকার

বাংলাদেশের মূল সংবিধান মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং নানা কাঁটা ছেড়ার পরও এই অগ্রাধিকারকে বহাল আছে। সংবিধানে বলা আছে যে স্থানীয় পর্যায়ে- (১) প্রশাসন ও কর্মচারীদের কার্য, (২) জনশৃঙ্খলা রক্ষা, (৩) জনগনের কার্য ও উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের উপর দিতে হবে। সংবিধানে আরো বলা আছে যে স্থানীয় শাসনের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর আরোপ, বাজেট প্রস্তুত ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে। এছাড়া সংবিধানের ১৯ (১) এ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রাজস্ব/ কর কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।[২]

বেসরকারিকরণ, দূর্নীতি ও কেন্দ্রিয় অব্যবস্থাপনার কারণে। শিল্প ও শ্রম উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০০-২০০১ সালের জরীপ মতে সারা দেশে ২৪,৭৫২ শিল্প-কারখানার মধ্যে দেশের মধ্যাঞ্চলে ছিল (ঢাকা বিভাগ) ১১৫৮৮, পূর্বাঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) ৪২৩৫, উত্তরাঞ্চলে (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) ৬৫৭০ এবং দক্ষিণাঞ্চলে (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) ২৩৫৯টি শিল্প। অপরদিকে কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির সক্ষমতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কৃষি উৎপাদনে (২০০৮) পূর্বাঞ্চল পিছিয়ে আছে (একর প্রতি ফলন ২২ মণ), যেখানে মধ্যাঞ্চলে ৩৯ মণ, উত্তরাঞ্চলে ৩৯ মণ, দক্ষিণাঞ্চলে ৩২ মণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে অবশ্য মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে ফলন অনেক কম হয়েছে (যথাক্রমে ৩১ ও ২১ মণ) ২০০৯ সালে (বিআইডিএস, ২০১০)। সুতরাং স্থানিক দারিদ্র দূরীকরণে বাজেটে এসব প্রেক্ষপট বিবেচনায় না আনলে বৈষম্য আরো বাড়ার আশংকা থাকবে। সেক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ও দারিদ্রপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে বিশেষ ও পৃথিকীকরণ বিনিয়োগ সুবিধা রাখতে হবে বার্ষিক পরিকল্পনায়।

এডিপির দ্রুত বাস্তবায়নে বিকেন্দ্রিত বাজেট ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

দারিদ্য দূরীকরণে এডিপি বাস্তবায়নের নিম্নগতি অন্যতম বাঁধা এবং কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে এখন নিত্যদিনের চ্যালেঞ্জ। অথচ স্থানীয় সরকারগুলো তার পুরো বাজেট ব্যয় করতে পারদর্শীতা দেখালেও স্থানীয় সরকারকে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ দিতে কেন্দ্রিয় সরকারের প্রচন্ড অনীহা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে স্থানীয় সরকারের জন্য থোক বরাদ্দ ছিল: সংকীর্ণ পরিমাপ (১): (গ্রাম+ইউনিয়ন+উপজেলা) - ৪১৫ কোটি টাকা; মাঝারি পরিমাপ(২): {পরিমাপ (১)+পৌরসভা+জেলা} - ৭৬৫ কোটি টাকা; বৃহত্তম পরিমাপ(৩): পরিমাপ (১)+পরিমাপ (২)+ সিটি কর্পোরেশন - ৬৩০ কোটি টাকা। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো যাবে নি:সন্দেহে।

বিকেন্দ্রিকরণ ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

আওয়ামী লীগের দিন বদলের সনদের ৫.৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভার্নেন্স চালু করা হবে।....."। ৬ নং অনুচ্ছেদে 'অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ' কর্মসূচি হিসেবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ''ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ণ করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে। জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃংখলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।[৪]" এই দুটি ঘোষণার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের রূপকল্প বা ভিশন ২০২১ দলিলের ২ নং ধারায় তথা রাজনৈতিক কাঠামো, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গণঅংশায়ন অংশে উল্লেখ করা হয়েছে: "স্থানীয় সরকারকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে স্থানীয় সরকার। এ উদ্দেশে জেলা ও উপজেলার স্থানীয় সরকারকে স্বনির্ভর ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।[৫]"

গণতান্ত্রিক বাজেটের মূল প্রস্তাবনা

জাতীয় বাজেট প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

কৌশল হিসেবে জেলা ভিত্তিক বাজেট (প্রাথমিক পর্যায়ে) এবং পর্যায়ক্রমে আইন নির্ধারিত অন্যান্য স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বাজেট প্রণয়ন করা।

সেক্টরভিত্তিক পদ্ধতি বা বাজেট বরাদ্দ পরিহার করা, বরং জেলা বা আঞ্চলিক বাজেট কাঠামোতে সেক্টরভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ রাখা।

জাতীয় বাজেট ও আঞ্চলিক বাজেটের খাত/বিভাগসমূহ আলাদা করা। আঞ্চলিক পর্যায়ে বিকেন্দ্রিকরণের জন্য সম্ভাব্য খাতসমূহ নির্দিষ্ট করা, যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী, শিশু, কৃষি সম্প্রসারণ, শিল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

জাতীয় বাজেট ও আঞ্চলিক বাজেটের পরিপূরক খাতগুলো এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার ভিত্তিতে সম্পদ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

কর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দ করা।

সুষম জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অধিকতর দারিদ্র প্রবণ অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেয়া।

আঞ্চলিক ও জাতিগত বৈষম্য বিবেচনা করা।

সাংসদদের কার্যকরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জাতীয় সংসদে জেলা/ অঞ্চল ভিত্তিতে বিস্তারিত আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করা।

প্রতিবেশ পরিবেশ বিবেচনায় বাজেটকে বিবেচনা করা ও অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া/ সূচক নির্দিষ্ট করা।

আঞ্চলিক বাজেটের জন্য শুধু লজিস্টিকস্ নয়, সেবার মান উন্নত করার জন্য কর্মসূচি নেয়া। ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরি জনবলকে অন্যতম বিবেচনা হিসেবে নেওয়া।

বাজেটে অধিকারভোগি বা উপকারভোগির মতামতের প্রতিফলন করা।

বাজেট প্রক্রিয়ায় জনগনকে সম্প্রক্ত করার জন্য কার্যকরি ইলেক্ট্রনিক সরকার ব্যবস্থা (ই-গভার্নেন্স) চালু করা।

শেষ কথা

সংবিধান মোতাবেক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার এখন সময়ের দাবি। গত চার দশকে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষণা, আলোচনা ও আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পাশাপাশি জাতীয় বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনার বিকেন্দ্রিকরণের বিষয়টি তেমনভাবে উঠে আসেনি কোন নীতি আলোচনায়। অথচ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রাজস্ব/ কর কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ প্রয়োজন। কেননা আমলানির্ভর ও অতিকেন্দ্রীভূত জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় সাংসদদের কার্যকরি অংশগ্রহণের সুযোগই যেখানে সীমিত সেখানে সাধারণ নাগরিক ও পেশাজীবীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অনেক জঠিল ও কঠিন বিষয়। বাজেট প্রক্রিয়ার ও কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ ছাড়া তাই কার্যকর জনঅংশগ্রহণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাজেটসহ নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন জণগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকার কারণে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রায় অনুপস্থিত, যার ফলে দূর্নীতি আজ দারিদ্র দূরীকরণে সবচেয়ে বড় কাঠামোগত বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে বাজেটকে গণতান্ত্রিক করার আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে যেখানে স্থানীয় নাগরিক কমিটি, উন্নয়ন সংগঠন, তৃণমূল সংগঠন, সংবাদমাধ্যম/ গোষ্ঠি ও সমাজের অন্যান্য অগ্রসর চিন্তাধারার মানুষেরা দেশের সকল মানুষের ন্যায্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের কাছে ওকালতি করতে কাজ করবেন। এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সে লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

---

১. আবুল মাল আবদুল মুহিত : জেলায় জেলায় সরকার। ইউপিএল,ঢাকা, ২০০২। পৃষ্ঠা: ৮৩।

২. বাংলাদেশের সংবিধান।

৩. এম এম আকাশ : স্থানীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতায়ন: প্রথম বাজেটে হয়নি– দ্বিতীয় বাজেটে হবে কি? জাতীয় প্রেস ক্লাবে গভার্নেন্স কোয়ালিশন আয়োজিত জাতীয় বাজেট ও স্থানীয় সরকার শীর্ষক মতবিনিময় সভায় পঠিত প্রবন্ধ । ঢাকা, ২০১০।

৪. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: দিন বদলের সনদ। ঢাকা, ২০০৮।

৫. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: রূপকল্প ২০২১। ঢাকা, ২০০৮।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

সবার জন্য বাজেট, সবাই মিলে বাজেট

প্রচারে: গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন। বাড়ি-৫৭৩, নাটোর রোড, রামচন্দপুর, রাজশাহী।
www.budgetdemocracy.wordpress.com